সংবাদ

08 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ...

শিক্ষায় বিপর্যয় বনাম জাতির বিবেক

ড. মিহির কুমার রায়

শিক্ষা নিয়ে সমাজে অনেক কথোপকথন রয়েছে যেমন শিক্ষাই জাতীর মেরুদণ্ড, শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন, শিক্ষায় আলোকিত মানুষ তৈরি করে ইত্যাদি। কিন্তু সময়ের আবর্তে অতি আধুনিকতার কবলে পড়ে এই ধরনের প্রবাদ বাক্যগুলোর রূপান্তর ঘটেছে। তাই আক্ষেপ করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আবু সাঈদ বলেছিলেন আমি নিষ্ফলা মাঠের কৃষকের মতো আমার সারা শিক্ষকতার জীবনে ফুল ফুটাতে ব্যর্থ হয়েছি এবং এই ব্যর্থতার গ্লানি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে কিভাবে আলোকিত মানুষ তৈরি করা যায়। এই উদ্যোগের সফল্য স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি এশিয়ার নোবেল পুরস্কার বলে খ্যাত রেমন্ড ম্যাগসেসি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সে যাই হউক না কেন শিক্ষা সর্বজনীন, শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা দান একটি পবিত্র সেবা ইত্যাদিগুলো একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সুষম মানবিকায়নে অনুশীলন হয়। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসারী ছিলাম এবং সেই আদলেই আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল যার মুখ্য উদ্দেশ্য মানবীয় মূলধন তৈরি, যা নৈতিকতার আবর্তে মণ্ডিত। যারা শিক্ষা প্রদান করত অর্থাৎ শিক্ষক তারা ছিল নিজ নিজ বিষয়ে পণ্ডিত সেটা স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় হোক না কেন। শিক্ষকের মর্যাদা কিংবা শিক্ষার্থীর মর্যাদা রক্ষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট শতর্ক ছিল এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাবোধের জায়গাটি ছিল খুবই পবিত্র। অনেক শিক্ষক তাদের স্বল্প বেতনের টাকা দিয়ে গরিব ছাত্রদের টিউশন ফি দিত যদিও তাদের পারিবারিক অবস্থা ছিল অসচ্ছল এবং অনেক শিক্ষক ছাত্রদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিত পড়াশোনার অগ্রগতির ব্যাপারে। ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত অনেকটা পরম আত্মীয়ের মতো। মফস্বল ও শহরের শিক্ষার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য ছিল না বরং অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের স্কুলগুলো থেকে ছাত্ররা বোর্ডের পরীক্ষাগুলোতে মেধার তালিকায় সম্মানজনক স্থান করে নিত অহরহ। যেমন মাদারীপুরের কালকিনী থানার শশীকর হাইস্কুল থেকে ১৯৭০ সালে সম্মিলিত মেধার তালিকায় ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান পেয়েছিল শ্রী অতুল চন্দ্র নাথ। পঞ্চাশের দশকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আখতার হামিদ খান তার স্বল্প বেতনের টাকা নিয়ে কখনও ঘরে ফিরতে পারতেন না কেবল দারিদ্র্যপীড়িত ছাত্রদের পড়ার খরচ মেটাতে গিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শান্তিনিকেতন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলায় ঘুরে বেরিয়েছিলে চাঁদা তোলার প্রত্যয়ে এবং ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ থেকে সেই আমলে একশত পঁচিশ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা ছিল প্রকৃতি নির্ভর এবং অধ্যাত্মিকতা, যা ছিল নৈতিকতা পুনর্গঠনের বড় হাতিয়ার। এই প্রতিষ্ঠানটিতে বিশ্বের নামিদামি নেতা-নেতৃদের সন্তানরা পড়াশোনা করতে আসতেন। পরবর্তীতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় এটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার প্রধান অনুশীলক ছিল এই বিদ্যাপীঠ। কিন্তু রবীন্দ্র নাথের শিক্ষা চিন্তা ও আজকের বিশ্বভারতী এর উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার উপাচার্য্য অধ্যাপক নিমাই সাধক বসু কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দেশ পত্রিকায়' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'ভঙ্গনীড় বিশ্বভারতী' আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল যেখানে তার উপাচার্য্য জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছিল এই আক্ষেপ করে যে কিভাবে এই দেশ বরেণ্য প্রতিষ্ঠানটি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে। স্যার আশুতোষ মুখার্জী যখন এই উপমহাদেশের সবচাইয়ে পুরানো উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপীঠ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তখন তার অধস্তন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা হলেই হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে অফিসের চেয়ারে বসতেন। এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সুবাদে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর তার শিক্ষকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং এর একটি পর্যায়ে শিক্ষকের পায়ে ছুয়ে আশীর্বাদ নেয়ার সময় বিষয়টি মিডিয়ার নজরে আসে। এর ঠিক পরের দিন কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এর প্রথম পৃষ্ঠার খবর 'শিক্ষকের সম্মান' নামে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক ভবতোষ দত্ত বলেছিলেন মফস্বল থেকে আসা এক ছাত্রের মেধার গল্প যে এর আগে কলকাতা শহর দেখেনি এবং সেই ছাত্রের আদি নিবাস পূর্ব বাংলার মানিকগঞ্জে যিনি উনিশশত আটানব্বই সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন কল্যাণকামী অর্থনীতে অবদানের জন্য। তিনি হলেন নোবেল বিজয়ী তিন বাঙালি মনীষীর একজন অধ্যাপক অমর্ত্য কুমার সেন যার মাতুলালয় মুন্সীগঞ্জের টুঙ্গিবাড়ী থানার সোনারং গ্রামে এবং ঠাকুর দাদা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহচর ক্ষীতি মোহন সেন। এখন সময় অনেক বদলে গেছে, ব্রিটিশ থেকে পাকিস্তান, তার থেকে বাংলাদেশের পঁয়তাল্লিশ বছরে অনেক রূপান্তর ঘটেছে শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অনেকে বলেন আগেকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কাঁচা মাটির তৈরি কিন্তু শিক্ষকগুলো ছিল পাকা মাটির তৈরি কিন্তু বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে একেবারে উল্টোটি অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাকা বাড়িতে কিন্তু শিক্ষকরা কাঁচা মাটির উপর দাঁড়িয়ে। শিক্ষা ও শিক্ষক নিয়ে এ ধরনের লোকাচারের ভিত্তিই বা কি তা নিবিড় বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে আনুপাতিকহারে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা) এবং মানসম্মত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়েনি। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বিশ্বায়নের নীতিমালা। সেকাল আর একালের চিন্তায় অনেক বড় ধরনের ব্যবধান লক্ষণীয়। পূর্বেকার সময়ে শিক্ষানুরাগী জমিদাররা তাদের প্রজাদের কল্যাণে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল, যা নিজস্ব স্বকীয়তায় শিক্ষা বিস্তারের একটি ভিত্তি তৈরি করেছিল।

পরবর্তীতে খ্রিস্টান কমিউনিটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসারে এগিয়ে এসেছিল যা এখনও উচ্চমান নিয়ে সুধী সমাজে পরিচিত। পাশাপাশি সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সীমিত সামর্থ্যের পরিসরে শিক্ষা সেবা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, যা ব্রিটিশ শাসনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানি শাসনে আরও পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশি শাসনে আরও বত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট আটত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি সরকারি কাঠামোতে প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি কলেজ ও সরকারি মহিলা কলেজসহ কোন কোন উপজেলা সদরে সরকারি কলেজ রয়েছে। এই সাধারণ শিক্ষার বাইরেও প্রায় প্রতিটি পুরাতন জেলা সদরে একটি করে মেডিকেল কলেজ ও সারাদেশের প্রতিটি বিভাগে কারিগরি কলেজ রয়েছে। অপর দিকে বেসরকারি কাঠামোতে বর্তমানে পঁচানব্বইটি বিশ্ববিদ্যালয়, অগণিত কলেজ ও স্কুল রয়েছে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে যারা সারাদেশের শিক্ষা সেবা মেটাতে সর্বদা ব্যস্ত। সরকার এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের যে সব উপজেলায় সরকারি কলেজ ও স্কুল নেই সে সব এলাকায় একটি করে পর্যায়ক্রমে কলেজ ও স্কুলকে সরকারিকরণ করবে। এই সব উদ্যোগের পরও শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মান নিয়ে প্রতিনিয়তই আলোচনা হয় বিভিন্ন মহলে বিশেষত: পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ফলাফলে গ্রেড বিস্ফোরণ নিয়ে অর্থাৎ শিক্ষা এখন ফলাফল মুখী জ্ঞানমুখী নয়। এই সুযোগে বেশকিছু কোচিং সেন্টার অবাধে শিক্ষা বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে এবং শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের দিকে তাকিয়ে অবাধে অর্থ খরচ করছে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ফলাফলে দেখা গেছে যে ইংরেজি বিভাগে মাত্র একজন উত্তীর্ণ হয়েছে এবং অন্যান্য বিভাগেও কোটা পূরণ হয়নি অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাওয়ার পরও এই পরিস্থিতি অনেককে হতাশ করেছে। এই ধরনের ফলাফল পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিতান্তই কম নয় এবং সরকারি পর্যায়েও একটি অঘোষিত নীতি রয়েছে পাসের হার বাড়ানো সেখানে মানের প্রশ্নটি অবহেলিত। আবার এই প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে মনে হয় শিক্ষার্থীর চেয়ে অভিভাবকরাই বেশি উদ্বিগ্ন বিশেষত সন্তানদের ফলাফল নিয়ে। আবার সিলেবাস নিয়ে কিংবা পদ্ধতি নিয়ে যত পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে সরকারি পর্যায়ে যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। এর ফলে অনেক শিক্ষক রয়েছেন যারা এই ধরনের পরিবর্তনগুলোতে তারা অনেক ক্ষেত্রে বিরক্ত হয়ে অন্ধকারে সাঁতরায়।

আবার বর্তমান সময়ে শিক্ষা পেশা হিসাবে মেধাবীদের বিবেচনায় অনেক পেছনে পড়ে গেছে সত্যি তার পরও বেতন বহির্ভূত আয় বর্তমানে শিক্ষকদেরও কম নয় পরিস্থিতির কারণে। কথা ছিল সরকারি খাতে শিক্ষা ব্যবস্থা হলো একটি সেবাধর্মী কাজ আর বেসরকারি খাতে শিক্ষা হলো পণ্য যা অধিক অর্থ ব্যয়ে উপার্জন করতে হয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষা পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে বেপারির ভূমিকায় অবতীর্ণ শিক্ষক। এই বাণিজ্যে ছাত্ররা বই ছেড়ে ইনটারনেট নির্ভর হয়েছে যা অনেকাংশে নির্ভুল নয়। যদি অল্প কষ্ট করে একটি পাঠ্যসূচি আয়ত্ত করা যায় তা আবার নিজেদের মধ্যে শুণন করে অবাধে বিতরণ করা হয় তা হলে গ্রন্থাগারে বসে সময় কাটানোর প্রয়োজন কি? এতে করে সীমিতসংখ্যক পড়ে যদি বেশি মাত্রার সুবিধা পাওয়া যায় তবে কে কষ্ট করে রাত জাগবে। ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ। এই সনাতন ধারণাটি নিয়ে আমরা বড় হয়েছিলাম কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম মনে করে এই অধ্যয়ন নিয়ে তারা যে সময়টি ব্যয় করবে তার চেয়ে মোবাইল ফোনে ভিডিও গেম খেলা কিংবা ল্যাপটপে বসে সিনেমা দেখা অনেক শ্রেয়। এখন প্রশ্ন হলো এই অবস্থায় অভিভাবক পিতামাতার ভূমিকা কি? তারা যদি তাদের পোষ্য শিক্ষর্থীর প্রতি যত্নবান না হয় তাহলে বিপর্যয় অনিবার্য এবং বাস্তবে তাই ঘটছে। ঘরে অভিভাবক ও বাইরে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক দ্বারা শাসিত হবে এই ধারণাটি চিরাচরিত ছিল ছাত্রদের জন্য। কিন্তু না আছে ঘরের শাসন না আছে শ্রেণী কক্ষের শাসন। যার ফলে শিক্ষার্থীরা ছিটকে পড়েছে বিপথে। অপরদিকে শিক্ষার মূল দর্শনের সঙ্গে পাঠদানসূচির তেমন কোন মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তারপর আবার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের অসহযোগিতা বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে। যেমন বর্তমানে একটা রেওয়াজ হয়েছে প্রাইভেট পড়ানো অর্থাৎ শিক্ষকরা বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্লাসে তেমন মনোযোগী থাকেন না এবং শিক্ষার্থীদের বাসায় প্রাইভেট কোচিং-এ বাধ্য করানো হয়। যারা এতে সাড়া দেয় তারা বিশেষ সুবিধা পায় যেমন পরীক্ষা প্রশ্ন বলে দেয়া, বেশি নম্বর পাইয়ে দেয়া। আর এই প্রক্রিয়ায় যারা সাড়া না দেয় তাদের ভাগ্যে জোটে উল্টোটা। আর উচ্চ শিক্ষায় বিয়টি আরও জটিল। শিক্ষকরা সময়মতো ক্লাসে আসেন না এবং এলেও নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ক্লাস ত্যাগ করেন। যদি কোন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করেন তাতে শিক্ষক রাগান্বিত হন। শিক্ষার এই ঘাটতি পূরণে ছাত্রছাত্রীরা সমান্তরালভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাসের পাশাপাশি প্রাইভেট কোচিং চালিয়ে যায়, যা অভিভাবকদের ঘাড়ে এক বাড়তি খরচের বোঝা। এই ধরনের অনুশীলন শিক্ষকদের নৈতিক ভিত্তির জায়গাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে আর শিক্ষাকে করেছে বাণিজ্যকরণ, যা উদার কিংবা বাজার অর্থনীতির কুফল। শিক্ষা প্রশাসন বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ে একেবারেই ভেঙে পড়েছে কারণ প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ কিংবা উপাচার্য কারও শিক্ষকদের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং কে কখন ক্লাসে আসা-যাওয়া করে, সঠিকভাবে ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে কিনা তার কোন পর্যবেক্ষণ নেই।

এমন খবরও পাওয়া যায় প্রধান শিক্ষক কিংবা অধ্যক্ষ কর্মস্থলে অবস্থান করেন না। ফলে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছে তা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ কিংবা নিজের দেশে চাকরির বাজারে প্রবেশ করতে সহায়ক হবে না। এই বিপর্যয় জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মেধাবিহীন করে তুলবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে শিক্ষার রেটিং-এ বাংলাদেশের কোন স্থানই করে নিতে পারছে না। তাই এ দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, আমরা একেবারেই মূর্খ লোকদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছি। এরই মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদের আছর পড়েছে, যা নিয়ে সারা জাতি উদ্বিগ্ন এবং এর একটি বড় কারণ সুস্থ রাজনীতি চর্চার অভাব। বেসরকারি কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ আর সরকারিগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে কোন কার্যকরী ছাত্র সংসদ নেই, যেখানে বসে শিক্ষর্থীরা সুস্থ ধারার রাজনীতি চর্চায় নিমগ্ন থাকবে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা-নেত্রী তৈরির পথে অন্তরায়। আবার শিক্ষা প্রশাসনের অসঙ্গতি তুলে ধরার কোন ফোরাম নেই। দীর্ঘদিন যাবত চলা এই ব্যবস্থাগুলো শিক্ষার প্রসারে সহায়ক তো নয়ই বরং এই ক্ষেত্রে আমাদের যে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য তা বিনাশকারী। এর একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান একদিনে সম্ভব নয় এবং বর্তমান সরকার শিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করলেও তার সুফল জাতি তেমন পাচ্ছে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার অতীব রাজনীতিকরণের ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রবেশ একেবারেই সীমিত হয়ে এসেছে। ফলে 'ভালো শিক্ষক ছাড়া ভালো ছাত্র তৈরি হয় না'– এই প্রবাদটি এখন সনাতন। ভালো শিক্ষক তৈরির একটি উত্তম পথ শিক্ষার সঙ্গে গবেষণাকে সম্পৃক্ত করা এবং শিক্ষক গবেষক তৈরি করা। বর্তমানে দেখা যায় অনেক শিক্ষক আছেন যারা বই লিখে ছাত্রদের মধ্যে বিক্রির এক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে যেগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের, ভুলে ভরা এবং অন্যের বই থেকে অনুকরণ করা, যা কাম্য নয়। ছাত্রদের লাইব্রেরিমুখী করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং সব ধরনের আধুনিক সুবিধা সংযোগ করতে হবে। ছাত্র বৃত্তির প্রসার ঘটাতে হবে এবং শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার করতে হবে। তাহলে সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন হবে।

[লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ]